Downloaded from: justpaste.it/5c89x

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

এনজিওদের পরিবার পরিকল্পনা তৎপরতা না-কি মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস করার ষড়যন্ত্র?

আব্দুল্লাহ আল-ফারুক

==========

ব্র্যাক এনজিওর দারিদ্র বিমোচনের আরও কিঞ্চিৎ নমুনা

দেশের এনজিও সাম্রাজ্যের ‘সম্রাট’ হল ফজলে হোসেন আবেদের 'ব্রাক' নামক এনজিও। এই এনজিও ইতিমধ্যে দারিদ্র বিমোচনের নামে দেশব্যাপী চড়া সুদে যে মহাজনী ঋণ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে তার প্রতিবাদে দেশে গণরোষের সৃষ্টি হয়েছে। ঘৃণা, ধিক্কার এবং এদের শোষণের হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষার জন্য সরকারের কাছে আবেদন রেখে দেশের সর্বত্র বিক্ষোভ মিছিল আয়োজিত হয়েছে সচেতন নাগরিকদের উদ্যোগে। সম্প্রতি বগুড়ার কতিপয় ঘটনাকে প্রপাগান্ডার রং লাগিয়ে কতিপয় চিহ্নিত পত্রিকার মাধ্যমে দেশব্যাপী বিভ্রান্তি সৃষ্টির অন্তরালের প্রধান হোতা ছিল এই সেবার তকমাধারী এনজিও। দেশব্যাপী এই এনজিওর বিরুদ্ধে যে গণরোষের সৃষ্টি হয়েছে তার সাথে সামিল হয়েছে যশোরের মনিরামপুরের কিছু নিরক্ষর মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ও। স্বভাবে সরল-সহজ এবং নিরক্ষর হলেও তারা ব্রাকের ঋণের নামে চড়া সুদের মহাজনী ব্যবসা ও শোষণের ফন্দি ঠিকই ধরে ফেলেছে। ফলে তারা এই শোষণ বন্ধের প্রতিবাদে মিছিল, মিটিং করতে বাধ্য হয়েছে। এ সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় (১২ মে, ১৯৯৪) এক বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়-

মনিরামপুর ঝাপা বাওড় এলাকায় ব্র্যাক এনজিও নির্যাতন চালাচ্ছে

ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড বন্ধের দাবীতে যশোরের মনিরামপুর থানার ঝাপা বাওড় এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীরা মিছিল করেছে। মিছিলের শ্লোগান ছিল ব্র্যাকের শোষণনীতি বন্ধ কর, ঋণ নেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি চলবে না-ব্র্যাক ম্যানেজারের অত্যাচার বন্ধ কর ইত্যাদি। গত বৃহস্পতিবার ব্র্যাকের বিরুদ্ধে প্লাকার্ডসহ মিছিলটি রাজগঞ্জ বাজার প্রদক্ষিণ করে।

ঝাপা বাওড় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বজলুর রহমানের এক লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, ৭০০ একর আয়তনের বাওড়টিতে ২০৯ জন মৎস্যজীবী দীর্ঘদিন ধরে মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। মৎস্যজীবীরা আর্থিকভাবে মোটামুটি সচ্ছল। ব্র্যাক এনজিও ৯২ সালের শেষের দিকে রাজগঞ্জ বাজারে অফিস স্থাপন করে। তারা মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ ও ঋণদানের একটি প্রকল্প হাতে নেয়। ব্র্যাক প্রথমেই মৎস্যজীবীদের ঋণ গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। মৎস্যজীবীরা ঋণ নিতে অস্বীকার করে। এতে ব্র্যাক ক্ষিপ্ত হয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বাদ দিয়ে নতুন করে মৎস্য- জীবীদের একটি তালিকা তৈরীর চেষ্টা চালায়।ব্যর্থহয়ে ব্রাক কৌশলে মৎস্যজীবীদের মূল তালিকা রদবদলের চেষ্টা চালাতে থাকে এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যারা ব্র্যাকের ঋণ গ্রহণ করবে না, তারা মৎস্যজীবী সমিতির সদস্য থাকতে পারবে না। এর ফলে সাধারণ মৎস্যজীবীদের মধ্যে আতংক ও ভীতির সৃষ্টি হয়।

এ পর্যায়ে ঝাপা বাওড় ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে মনিরামপুর আদালতে ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক মৎস্যজীবীদের তালিকা রদবদলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারীর আবেদন জানানো হয়। আদালত রদবদলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এরপর ব্র্যাক যশোর সাব জজ আদালতে মিস আপিল দাখিল করে। বিজ্ঞ সাব জজ আদালতও নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখার আদেশ দেন। ব্র্যাক ঋণ দিতে ব্যর্থ হয়ে মৎস্যজীবীদের নানাভাবে হয়রানির পদক্ষেপ নেয়। অভিযোগ পাওয়া গেছে, ব্র্যাক মনিরামপুর থানা পুলিশের সহযোগিতায় ঝাপা বাওড় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বজলুর রহমানসহ বেশ কয়েক জন মৎস্যজীবীর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করে। এ মামলার সূত্র ধরে থানার কর্মকর্তা দারোগা সেলিম বজলুর রহমানসহ বেশ কয়েক জন মৎস্যজীবীর ওপর নানাভাবে হয়রানি শুরু করে। ঐ দারোগার বিরুদ্ধে এ ছাড়াও মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে ভয়ভীতি দেখিয়ে অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঝাপা বাওড় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সম্প্রতি উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক অপরাধ তদন্ত বিভাগ, পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা বরাবর এক লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। রাজগঞ্জের ব্র্যাক এনজিও শতকরা ৫২ টাকা হার সুদে ঋণ দেয়ার জন্য ঝাপা বাওড় মৎস্যজীবীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে।ঋণ নিতে সরাসরি যারা অস্বীকার করেছে, তাদের ব্র্যাক পুলিশ দিয়ে হয়রানি করছে।

গত ৯ মে ৯৪ ঝাপা বাওড়ের কয়েক জন মৎস্যজীবী পুলিশ সুপার যশোরের বরাবর এক লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, দারোগা সেলিমের সাথে চুক্তির মাধ্যমে ব্র্যাক ম্যানেজার মৎস্যজীবীরা অসহায় অবস্থার দিন কাটাচ্ছে।

এলাকার লোকজন অভিযোগ করেছেন, ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডে ঝাপা বাওড়ের সাধারণ মৎস্যজীবীরা দারুণভাবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তার ওপর পুলিশী নির্যাতন শুরু হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন এ ব্যাপারে, কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। স্থানীয় প্রশাসনও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

একি হাসপাতাল না ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড পরিচালনার দুর্গ?

সেবার নামে এনজিওরা আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন করেছে দিনাজপুরে অজপাড়াগা ধানজুড়িতে, বাকেরগঞ্জে, শিমপুরে, (পাদ্রী শিবপুর), সাতক্ষীরা, সরুলিয়া ও ধানিদিয়ায়, কক্সবাজারের মালুমঘাট ডোনহাজারীতে। দেশের যেখানেই অনগ্রসর মানুষের বাস, সেখানেই খ্রিষ্টান মিশনারীরা তাদের আস্তানা গেড়েছে। প্রধানত তারা তিনটি উপায়ে মানবতার সেবা নামক ধর্ম-কর্ম সম্পাদন করে থাকে। এক, নগদ অর্থ, দুই, চাকরি দিয়ে এবং তিন, চিকিৎসা সুবিধা দিয়ে-এসব অস্ত্র দিয়েই তারা গরীব দুঃখী এবং অনগ্রসর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। প্রথম পর্যায়ে এসব সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে আর ততখানি সহজ থাকে না। খ্রিষ্টানদের এই মানবতার সেবার সুযোগ পাওয়ার ফলেঃ

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার চা বাগান এলাকায় ১৯৬২ সালে মালুমঘাট খ্রিষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালটি স্থাপন করা হয়। এই হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু ১৯৬৫ সালে। হাসপাতালটি স্থাপনের সময়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিলো, সেখানে কোনভাবেই খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার করা যাবে না। মালুমঘাট খ্রিষ্টান হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ১৯৬৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করছেন ডাঃ ভিগো বি অলসেন এমডি।

চিকিৎসা দানের মত মহান সেবা ব্রতের নামে মালুমঘাট হাসপাতালের মূলত খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারই প্রধান লক্ষ্য। ইসলামী ফাউন্ডেশন পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়েছে, “ঐ খ্রিষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সুচনা লগ্ন থেকেই চিকিৎসা সেবার সাথে সাথে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। শুরু থেকে এ পর্যন্ত এর উদ্যোগে কমপক্ষে ১০ (দশ) হাজার লোককে ধর্মান্তরিত করেছে। পরবর্তীতে এদের বংশ পরম্পরায় পরিবার-পরিজনসহ বর্তমানে কমপক্ষে ৪০ (চল্লিশ) হাজার খ্রিষ্টান বৃহত্তর চট্টগ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রকৃতভাবে জরিপ চালালে এ সংখ্যা আরো বেড়ে যেতে পারে।”

যাদেরকে খ্রিষ্টান করা হয়, তাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অতীতে বহু লোককে ধর্মান্তরিত করে বিভিন্ন অঞ্চলে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

অন্যান্য খ্রিষ্টান হাসপাতালগুলোর মত মালুমঘাট খ্রিষ্টান হাসপাতালটিও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এবং চিকিৎসার অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে দুস্ত গরীব গ্রামবাসীদেরকে এই হাসপাতালটিতে ভিড় জমাতে হয়। অনেকে হাসপাতালটিতে কাজও পেয়ে যায় নার্স, আয়া, কাঠমিস্ত্রি, মালী বা মজুর হিসেবে। কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেলে এদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় খ্রিষ্টান হওয়ার জন্য। যারা খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়, তারা কাজে বহাল থাকে, যারা হয় না তাদের বিতাড়িত করা হয়। হাসপাতাল কম্পাউন্ডে ডাকযোগে বাইবেল প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

বিভ্রান্তিকর পদ্ধতি

খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারকরা গরীব কর্মচারী এবং রোগীদের মধ্যে সব সময়ই কতিপয় জঘন্য প্রচারণা চালিয়ে থাকেন। যেমন- “মুসলমান হওয়া মানেই গরীব দুঃখী হিসেবে জীবন যাপন করা। আর খ্রিষ্টান ধর্মগ্রহণ করা মানে ধনী ও বিলাসবহুল জীবনযাপন করা। প্রভু যিশুখ্রিষ্ট খ্রিষ্টানদের ওপর আশীর্বাদ করেছেন বলেই খ্রিষ্টানদের এ চরম উন্নতি আর মুহাম্মদের দুর্ভাগ্য বলেই তার অনুসারিরা এমন দুর্দশাগ্রস্ত।” খ্রিষ্টানদের বিনামূল্যে বিলিকৃত “মরণে নাহি ভয়" নামক বই-এ লেখা হয়েছে' (নাউজুবিল্লাহঃ এসব শয়তানী ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুণ। তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি) “বাইবেলের তুলনায় কুরআন অতি নিকৃষ্ট”, “মুহাম্মদের জীবনে ও শিক্ষায় কিছুই নাই। মুহাম্মদের বংশধর চোর।” অপর একটি বই শিষ্য-শিষ্যার কাহিনীতে বলা হয়েছে, “মুহাম্মদ নিজেই কুরআন রচনা করেছেন। তাই তিনি মিথ্যাবাদী।” তার সাহাবারা ও তৎকালীন আরববাসীরা জাহেল বলেই ইসলামের মত মুর্খতার ধর্ম প্রচার করা সম্ভব হয়েছে।”

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জরিপে আরো বলা হয়েছে, “খ্রিষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালে দরিদ্র রোগীদেরকে প্রথমত ভাল ওষুধ ও চিকিৎসা দেয়া হয় না এবং ওষুধ খাওয়ার সময় মুহাম্মদ বা রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণের নির্দেশ দেয়া হয়। এভাবে দু'একদিন যাওয়ার পরও রোগ অপরিবর্তিত থাকে, তখন বলা হয় যীশুখৃষ্টের নামে ওষুধ সেবন করে দেখ, হয়তো এতে আরোগ্য লাভ করবে। তখন ভাল ওষুধ ও চিকিৎসা সেবা দিয়ে রোগীকে সুস্থ করা হয়। পরবর্তীতে তাকে অত্যন্ত সূক্ষভাবে বুঝানো হয় যে, যীশুখৃষ্টের নামে ওষুধ সেবন করে যেমন আরোগ্য লাভ করেছ, তেমন স্বর্গে যেতে হলেও তার অনুসারী হতে হবে।”

চা বাগান এলাকায় হাসপাতালের একটু দক্ষিণে অবস্থিত একটি মসজিদে ৭০-এর দশকে আজান দেয়া নিষিদ্ধ ছিলো। অনেক আন্দোলনের পর অবশ্য সেখানে আজান প্রচারিত হচ্ছে। খ্রিষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চা বাগান এলাকার ১৯ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে তিনটি মসজিদকে বন্ধ করে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই খ্রিষ্টান হাসপাতাল এলাকায় আর একটি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে যে, এমন বেশ

কিছু পরিবার রয়েছে, যেসব পরিবারের স্বামী খ্রিষ্টান, স্ত্রী মুসলমান, এক ছেলে খ্রিষ্টান আর এক ছেলে মুসলমান। বয়স্ক লোকরা যখন খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হন, তখন তাদের নামের আগের মুহাম্মাদ শব্দটি তুলে দেয়া হয়!

চকোরিয়া থানা এলাকার এই অঞ্চল এতই অসহায় সম্বলহীন যে, একটি মাত্র দা অথবা জাল রুজী-রোজগারের একমাত্র অবলম্বন। এলাকারাসীর অধিকাংশই অভাবের তাড়নায় খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি ঝুকে পড়ে। বিগত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময় খ্রিষ্টানদেরকে প্রচুর সাহায্য দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের নামমাত্র সাহায্য দিয়ে বলা হয়েছে-এসব সাহায্য খ্রিষ্টান দেশ থেকে এসেছে। তাই মুসলমানদের জন্য এগুলো হারাম । [দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ই মার্চ ১৯৯৩]

পরিবার পরিরুল্পনা তৎপরতা, নাকি মুসলমানদের সংখ্যাহ্রাস করার ষড়যন্ত্র?

এদেশে বহু এনজিও সংস্থা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে এসব সংস্থার কর্মীরা এ পরিকল্পনার কাজ তদারক করছে। ওরা বলছে বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা একটা প্রধান সমস্যা। তাই জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্যই এই তৎপরতা। কিন্তু আমাদের দেশের জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ে বিদেশী সংস্থার এত মাথা ব্যাথা কেন? এ ব্যাপারে মাসিক 'জাগো মুজাহিদ' পত্রিকা [সেপ্টেম্বর ৯২] গবেষণা করে বিস্তারিত মতামত প্রকাশ করেছে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পাশ্চাত্যের কোটি কোটি সামরিক ও বেসামরিক লোক মারা যায়, চিরদিনের জন্যে প্রজনন ক্ষমতা সহ অন্যান্য ভাবে পঙ্গু হয়ে যায় আরও কয়েক কোটি মানুষ। এরা সবাই ছিল খ্রিষ্টান-ইহুদী ধর্মালম্বী।

ফলে পাশ্চাত্যের জনসংখ্যা হঠাৎ করে বহুহ্রাস পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালীর উপনিবেশীকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে বহু মুসলিম দেশ স্বাধীন হয়। পাশ্চাত্যের কুচক্রী মহল দেখল, মুসলমানরা বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ট জাতিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত এ দেশগুলোর যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ, মেধা আছে তার সাথে যদি এ বিপুল জনশক্তি যোগ হয় তাহলে অচিরেই তারা বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হবে। সুতরাং ওরা জিগির তুলল, "মানুষ বাড়ছে, বাড়ছে না সম্পদ ও জমি। শান্তিতে বাস করতে হলে এ সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।" ওদরে এজেন্টরা মুসলিম দেশগুলিতে এসে সুকৌশলে রসালো কথা বলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে একটা আতঙ্কে পরিণত করল। দেখুন না আজও পরিবার পরিকল্পনার যে সমস্ত উপাদান বাজারে পাওয়া যায় তা সবই উৎপাদিত হয় পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে। এগুলি বিতরণ, মার্কিটিং ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হোতা এন,জি,ও এবং বিভিন্ন সংগঠন যা সবই পাশ্চাত্যের লোকদের দ্বারা পরিচালিত, আশীর্বাদপুষ্ট। মুসলিম দেশের জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ে ওদের এত মাথা ব্যথার কারণটা কি?

আমরা মুসলমানরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন, পালন কর্তাও বটে। তিনি যে ভূখণ্ডে যতজন মানুষের ভরণ-পোষণ সম্ভব ততজন মানুষই সৃষ্টি করেন। তার সৃষ্টির মধ্যেই এর উৎকৃষ্ঠ প্রমাণ রয়েছে। যেমন, পশু-পাখি ও অন্যান্য জীব-জানোয়ারের সংখ্যাও তো প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কই তাদের তো আহারের অভাব হচ্ছে না বা আহারের অভাবে মারা যাচ্ছে না। তারা তো পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করছে না। আল্লাহ্ জীব সৃষ্টি করতে পারবেন কিন্তু তাদের অন্ন যোগাতে পারবেন না কাফিরদের মত আমরাও এ কথা বিশ্বাস করি কিভাবে? আমাদের দেশের জমি, সম্পদ বাড়ছে না, মানুষ বাড়ছে একথা সত্য। কিন্তু সকল মানুষই কি আহারের জন্য জমির উপর নির্ভরশীল? তাহলে জাপানের মত দেশ আমাদের দেশের চেয়ে কম জমি থাকতেও বিশ্ব অর্থনীতি একমাত্র পরাশক্তি হল কিভাবে? আল্লাহ্ মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য মেধা ও কর্মশক্তি দিয়েছেন।

জমীনে দিয়েছেন নতুন নতুন সম্পদ উৎপন্ন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার উপাদান। এই উৎপাদান, মেধা ও কর্মশক্তি যত বেশী ব্যবহার করা হবে, ততবেশী সম্পদ উৎপন্ন হবে, অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। এজন্য চাই সুষ্ঠু নীতি, দেশপ্রেমিক এবং জনকল্যাণকামী নেতৃত্ব। সরকারী প্রশাসনে দুনীতি, স্বজনগ্রীতি, অলসতা, কাজে ফাঁকি দেয়ার প্রবনতা থাকলে কখনই দেশের উন্নতি আশা করা যায় না। বরং এর কারণেই দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, রোগ শোকে ভোগে। এই ভোগান্তির জন্য বাড়তি জনসংখ্যা দায়ী নয়, দায়ী সুষ্ঠু নীতি, কর্মপ্রণালী ও নিষ্ঠাবান নেতৃত্বের অভাব। আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে, “তিনি কাউকে বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি।”

এই হলো দেশী বিদেশী এনজিও গোষ্ঠীর অপতৎপরতার কিছু খতিয়ান। কলাগাছের ন্যায় গজিয়ে ওঠা প্রায় প্রতিটি গ্রামে গ্রামে এদের কর্মীদের আনা-গোনা লক্ষ্য করা যায়। এদেশের ধর্মপরায়ণ সহজ সরল গরীব মানুষরা বোঝে না, সেবার নামে চকচকে ফনিনী গোখরার গোষ্ঠী যে ছোবলটা তার হৃদয়ে মেরেছে তা কত বিষধর, কত মর্মান্তিক এর পরিণতি। এরা শিশু শিক্ষা থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ আকিদা-বিশ্বাস ও ঈমানের ওপরও হস্তক্ষেপ করছে। বিদেশী অর্থপুষ্ট এনজিওকে যেভাবে ঢালাও স্বাধীনতা দেয়া হচ্ছে, তাতে সুস্পষ্টভাবেই জাতির লক্ষ্য অর্জন দূরুহ হয়ে পড়েছে । এখন জাতির জন্য স্বনির্ভরতা অর্জন নয়, বিদেশী সাহায্যের উপর স্থায়ী নির্ভরশীলতা অর্জনই নিশ্চিত করা হচ্ছে। আর একটি স্বাধীন জাতিকে যদি এভাবে বিদেশীনির্ভর করে রাখার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে অনুমোদন দেয়া হয় তার চাইতে দুঃখের ব্যাপার আর কি হতে পারে? আমরা আরও অবাক হচ্ছি, আমাদের দেশে যারা স্বাধীনতার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সোল এজেন্সি নিয়ে বসে আছেন, যারা যখন তখন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা উচ্চারণে ক্লান্তিহীন, বিদেশী অর্থপুষ্ট এনজিও সসমূহের বাড়াবাড়ির প্রশ্রে তারা কিন্তু রহস্যজনকভাবে মুখে তালা দিয়ে বসে আছেন।

এক সময় দেখা যেত, আমেরিকাসহ পশ্চিমা সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এদেশের বামপন্থীরা সারা দিনই প্রায় জিহাদ ঘোষণা করতেন। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশী মদদেই তাদের অনেকে এই পবিত্র কাজটি সম্পাদন করতেন। ফলে সোভিয়েত পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়ে যাবার সাথে সাথে এখন এই সব মৌসুমী বিপ্লবীদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু বন্ধ হয়ে গেছে বললেই সবটুকু বলা হয় না, তারা অনেকেই এখন এই সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অর্থে পরিচালিত এনজিও’র খাতায় নাম লিখিয়ে সাম্রাজ্যবাদ সেবার মাধ্যমে আখের গুছিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদেরও অনেকেই এখন উচ্চতর জ্ঞান চর্চার পরিবর্তে এনজিও সেবাকেই তাদের মোক্ষম পথ ধরে নিয়েছেন। এমতাবস্থায় সরকার তথাকথিত বিরোধী বা বামপন্থী শিবির থেকেও এনজিও ব্যাপারে তেমন প্রতিবাদের সম্মুখীন হবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু এ করেই কি জনগণের চোখকেও তারা ফাঁকি দিতে পারবেন?

এরা সুকৌশলে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে একটি মুসলিম জাতিকে অবিশ্বাসী বা খ্রিষ্টান বানানোর নীল নকশা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। এখানেই যদি এদেরকে রুখে না দেয়া হয়, এর বিকল্প ব্যবস্থা হাতে না নেয়া হয়, তবে অদুর ভবিষ্যতে আরও একবার যে আমরা পরাধীনতাসহ ব্যাপক ধর্মান্তরিত হওয়ার কবলে নিপতিত হতে যাচ্ছি তা নিশ্চিত করে বলা যায়। তাই যারা এর ভয়াবহতার গভীরতা উপলব্ধি করেন যারা এর ভবিষ্যৎ বাস্তব চিত্র দেখতে পাচ্ছেন, সেই ঈমান দীপ্ত বীর উত্তরসূরীদেরেকেই এ সবের মোকাবেলায় সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ ও স্বদেশ প্রেমিক বিচক্ষণ আলেম ও নাগরিকদেরকে এদিকে সতর্ক ও যথাযোগ্য দৃষ্টি রাখতে হবে। এর বিষফল থেকে জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত তারা যদি শুধু উপদেশ বিতরণ করে ক্ষান্ত হন, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে আপনারা অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকট এজন্য দায়ী থাকবেন। আর আপনাদের নাম লেখা হবে ইতিহাসের কালো অধ্যায়ে। স্পেন ও বাগদাদ পতনের প্রক্কালে

আত্মঘাতি সেই তথাকথিত আলিমদেরই পাশে। সে কলঙ্ক অনপনেয়। শত শতাব্দির পরিক্রমাও যে কলঙ্ক-দাগ মুছতে পারেনি। ইতিহাস তাদেরকে ক্ষমা করবে না। ক্ষমা করবে না পরবর্তী প্রজন্মও। অতএব কান্ডারী হুশিয়ার।

═══════════════════